১৩

স্থান -- বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী
কাল -- ফেব্রুআরি, ১৮৯৮

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাজার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সে-বার ঐ বাগানেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিপূজা[১] হয়। স্বামীজী নীলাম্বরবাবুর বাগানেই অবস্থান করিতেছিলেন।

জন্মতিথিপূজায় সে-বার বিপুল আয়োজন! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটি দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। পূজার তত্ত্বাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন, পৈতে এনেছিস্ তো?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তুত। কিন্তু এত পৈতের যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী -- দ্বি-জাতিমাত্রেরই[২] উপনয়ন-সংস্কারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আজ ঠাকুরের জন্মদিনে যারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেবো। এরা সব ব্রাত্য (পতিত) হয়ে গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়শ্চিত্ত করলেই ব্রাত্য আবার উপনয়ন-সংস্কারের অধিকারী হয়। আজ ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি, সকলেই তাঁর নাম নিয়ে শুদ্ধ হবে। তাই আজ সমাগত ভক্তমন্ডলীকে পৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?

শিষ্য -- আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অনুমতি অনুসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

স্বামীজী -- ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরূপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিষ্যকে ক্ষত্রিয়াদি দ্বি-জাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিয়া দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের তো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরস্পর পরস্পরের ভাই। 'ছোঁব না, ছোঁব না', বলে এদের আমরাই হীন করে ফেলেছি। তাই দেশটা হীনতা, ভীরুতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠায় গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভয়বাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে -- তোরাও আমাদের মতো মানুষ, তোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে। বুঝলি?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ।

স্বামীজী -- এখন যারা পৈতে নেবে; তাদের গঙ্গাস্নান করে আসতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম করে সবাই পৈতে পরবে।

স্বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন ভক্ত ক্রমে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া, শিষ্যের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতে পরিতে লাগিল। মঠে হুলস্থূল। পৈতে পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর মুখারবিন্দ যেন শতগুণে প্রফুল্ল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

---

[১] ২২ ফেব্রুআরি

[২] ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বি-জাতি

এইবার স্বামীজীর আদেশে সঙ্গীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের সন্ন্যাসীরা আজ স্বামীজীকে মনের সাধে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্ণে শঙ্খের কুন্ডল, সর্বাঙ্গে কর্পূরধবল পবিত্র বিভূতি, মস্তকে আপাদলম্বিত জটাভার, বাম হস্তে ত্রিশূল, উভয় বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয়, গলে আজানুলম্বিত ত্রিবলীকৃত বড় রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল।

এইবার স্বামীজী পশ্চিমাস্যে মুক্তপদ্মাসনে বসিয়া 'কূজন্তং রামরামেতি' স্তবটি মধুর স্বরে উচ্চারণ করিতে এবং স্তবান্তে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' এই কথা পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর অর্ধনিমীলিত নেত্র; হস্তে তানপুরায় সুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধ্বনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্য কিছুই আর শুনা গেল না! এইরূপে প্রায় অর্ধাধিক ঘন্টা কাটিয়া গেল। তখনও কাহারও মুখে অন্য কোন কথা নাই। স্বামীজীর কণ্ঠনিঃসৃত রামনামসুধা পান করিয়া সকলেই আজ মাতোয়ারা!

রামনামকীর্তনান্তে স্বামীজী পূর্বের ন্যায় নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন -- 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুরাঈ।' স্বামী সারদানন্দ[৩] 'একরূপ অরূপনাম-বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদঙ্গের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষে গঙ্গা যেন উথলিয়া উঠিল, এবং স্বামী সারদানন্দের সুকণ্ঠ ও সঙ্গে সঙ্গে মধুর আলাপে গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে সেগুলি গীত হইতে লাগিল।

এইবার স্বামীজী সহসা নিজের বেশভূষা খুলিয়া গিরিশবাবুকে সাদরে ঐ-সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহস্তে গিরিশবাবুর বিশাল দেহে ভস্ম মাখাইয়া কর্ণে কুন্ডল, মস্তকে জটাভার, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ ও বাহুতে রুদ্রাক্ষবলয় দিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু সে সজ্জায় যেন আর এক মূর্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ অবাক হইয়া গেল! অনন্তর স্বামীজী বলিলেন:

পরমহংসদেব বলতেন, 'ইনি ভৈরবের অবতার।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোন প্রভেদ নেই।

গিরিশবাবু নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে আজ যেরূপ সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজি। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবাবুকে পরান হইল। গিরিশবাবু কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুভ্রাতাদের ইচ্ছায় তিনি আজ অবাধে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন, জি. সি. তুমি আজ আমাদের ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব স্থির হয়ে বোস।

গিরিশবাবুর তখনও মুখে কোন কথা নাই। যাঁহার জন্মোৎসবে আজ সকলে মিলিত হইয়াছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্ষদগণের আনন্দ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে জড়বৎ হইয়াছেন। অবশেষে গিরিশবাবু বলিলেন, দয়াময় ঠাকুরের কথা আমি আর কি বলব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী তোমাদের ন্যায় বালসন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে তিনি এ অধমকে একাসনে বসিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করুণা অনুভব করি! কথাগুলি বলিতে বলিতে গিরিশবাবুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি অন্য কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না!

অনন্তর স্বামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা শেষ হওয়ায় ভক্তগণকে জলযোগ করিবার জন্য ডাকা হইল। জলযোগ সাঙ্গ হইবার পর স্বামীজী নিচে বৈঠকখানা-ঘরে যাইয়া বসিলেন। সমাগত

[৩] অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত

ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। উপবীতধারী জনৈক গৃহস্থকে সম্বোধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

তোরা হচ্ছিস দ্বি-জাতি, বহুকাল থেকে ব্রাত্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার দ্বি-জাতি হলি। প্রত্যহ গায়ত্রী-মন্ত্র অন্ততঃ একশত বার জপবি, বুঝলি?

গৃসস্থটি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিলেন। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্বাষণে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রবাবু প্রণাম করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বামীজী বারংবার বসিতে বলায় জড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বামীজী -- মাস্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ আমাদের কিছু শোনাতে হবে।

মাস্টার মহাশয় মৃদুহাস্যে অবনতবস্তক হইয়া রহিলেন। ইতোমধ্যে স্বামী অখন্ডানন্দ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় দেড়-মণ ওজনের দুইটি পান্তুয়া লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অদ্ভুত দুইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনন্তর স্বামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখান হইলে স্বামীজী বলিলেন, ঠাকুরঘরে নিয়ে যা।

স্বামী অখন্ডানন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন:

দেখছিস কেমন কর্মবীর! ভয়, মৃত্যু -- এ-সবের জঞ১ন নেই; এক রোখে কর্ম করে যাচ্ছে 'বহুহনহিতায় বহুজনসুখায়'।

শিষ্য -- মহাশয়, কত তপস্যার বলে তাঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

স্বামীজী -- তপস্যার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করলেই তপস্যা করা হয়, কর্মযোগীরা কর্মটাকেই তপস্যার অঙ্গ বলে। তপস্যা করতে করতে যেমন পরহিতেচ্ছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের জন্য কাজ করতে করতে পরা তপস্যার ফল -- চিত্তশুদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, প্রথম হইতে পরের জন্য প্রাণ দিয়া কাজ করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরূপ উদারতা আসিবে কেন, যাহাতে জীব আত্মসুখেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে।

স্বামীজী -- তপস্যাতেই বা কয় জনের মন যায়? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কয় জনই বা ভগবান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে? তপস্যাও যেমন কঠিন, নিষ্কাম কর্মও সেরূপ। সুতরাং যারা পরহিতে কাজ করে যায়, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্যা ভাল লাগে, করে যা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে -- তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস -- কর্মটা আর তপস্যা নয়?

শিষ্য -- আজ্ঞে হাঁ, পূর্বে 'তপস্যা' অর্থে আমি অন্যরূপ বুঝিতাম।

স্বামীজী -- যেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে একটা রোক জন্মায়, তেমনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করতে করতে হৃদয় ক্রমে তাতে ডুবে যায়। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হয়, বুঝলি? একবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরের সেবা করে দেখ না, তপস্যার ফল লাভ হয় কি না। পরার্থে কর্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙে যায় ও মানুষ ক্রমে

অকপটে পরহিতে প্রাণ দিতে উন্মুখ হয়।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি?

স্বামীজী -- নিজহিতের জন্য। এই দেহটা -- যাতে 'আমি' অভিমান করে বসে আছিস, এই দেহটা পরের জন্য উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিত্বটাকেও ভুলে যেতে হয়। অন্তিমে বিদেহ-বুদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাবনা ভাবি, ততটা আপনাকে ভুলে যাবি। এরূপে কর্মে যখন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়ে আসবে, তখন তোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান -- এ তত্ত্ব দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশ্বর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে -- আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা দ্বারা যেমন আত্মবিকাশ হয় পরার্থে কর্ম দ্বারাও ঠিক তাই হয়।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিন্তা করিব কখন? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবরূপী আত্মার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইবে?

স্বামীজী -- আত্মজ্ঞানলাভই সকল সাধনার -- সকল পথের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুই যদি সেবাপর হয়ে ঐ কর্মফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে সর্বজীবকে আত্মবৎ দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকি কি রইল? আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মতো -- এই দেওয়ালটা বা কাঠকানার মতো হয়ে বসে থাকা?

শিষ্য -- তাহা না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাস্ত্র আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন?

স্বামীজী -- শাস্ত্রে যাকে 'সমাধি' বলা হয়েছে, সে অবস্থা তো আর সহজে লাভ হয় না। কদাচিৎ কারও হলেও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তখন সে কি নিয়ে থাকবে বল? সে-জন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে গেছেন।

শিষ্য -- তবেই তো এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী -- শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে যে, পরার্থে সেবাপর হতে হতে সাধকের জীবন্মুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্মযোগ' বলে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিষ্য এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কিন্নর-কণ্ঠে গান ধরিলেন:

দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির-ঘরে।।
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদী 'পরে।।
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,

বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ তার তরে।।[৪]

গিরিশবাবু ও ভক্তেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। 'তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে' -- পদটি বারবার গীত হইতে লাগিল। অতঃপরে 'মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীলকমলে' ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধূম পড়িয়া গেল।

[৪] শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত